## দেশ


| | |
|---|---|
| মহাভারতের কথা | ১৩ |
| চন্দ্রগুপ্তের চোখ | ২১ |
| পৃথ্বীরাজের পক্ষীরাজ | ২৯ |
| শিবাজীর শিরস্ত্রাণ | ৩৭ |
| হরি সিং-এর হৃদয় | ৪৩ |
| সিপাহি বিদ্রোহের সিপাহি | ৪৯ |
| কুডি পাঞ্জাব দা | ৫৫ |
| নেতাজির নীল নকশা | ৬৩ |
| লেডি ম্যান্ডেলিন | ৭১ |
| এক থা টাইগার | ৮১ |


## বিদেশ


| | |
|---|---|
| ডবল এজেন্ট | ৯৫ |
| এজেন্ট এইচ টুয়েন্টি ওয়ান | ১০৫ |
| নো ম্যানস ল্যান্ড | ১১৭ |
| সত্যিকারের জেমস বন্ড | ১২৫ |
| মুখোশ মানুষ | ১৩৫ |
| খানসামার খাসখবর | ১৪৭ |
| দ্য মাইক্রোডট ফাইভ | ১৫৭ |
| সেলসম্যান | ১৬৭ |
| বিশ্বাসঘাতক | ১৭৭ |
| বিউটি অ্যান্ড দ্য বিস্ট | ১৮৩ |

# মহাভারতের কথা

বহু যুগ আগের কথা। তখনও পৃথিবীতে মানুষের উদ্ভব হয়নি। প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁর সৃষ্টির দ্বিতীয় পর্যায় শেষ করেছেন। মন্ত্রবলে সৃষ্টি করেছেন তাঁর সাত মানসপুত্রদের, যাঁরা সপ্তর্ষি নামে পরিচিত। তাঁরাই বেদ-পুরাণ, ন্যায়শাস্ত্র রচনার কাজে মন দিয়েছেন। এরই মধ্যে ব্রহ্মা দেবতা ও অসুরদের সৃষ্টি করে ফেলেছেন। তখনও তারা কেউই অমর নয়। তারা সবাই সময়ের সঙ্গে মরণশীল। দেবতারা নিজেদের স্বর্গে আনন্দেই দিন কাটাচ্ছিল, অন্যদিকে পাতালে অসুররা প্রথম থেকেই নিজেদের প্রতারিত ভাবতে শুরু করে দিয়েছে। দেবরাজ ইন্দ্র অবশ্য কিছুটা কূটনীতির আশ্রয় নিয়েই অসুরদের স্বর্গের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। অসুররা তখনও নিজেদের মধ্যে খণ্ড-ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠিতে বিভক্ত। তাদের নির্দিষ্ট কোনো রাজা নেই। যে ক্ষমতার বলে বলিয়ান হয়ে ওঠে, তখন অসুররা তাকেই অনুসরণ করে।

ঋষি ভৃগুর পুত্র শুক্রাচার্য ধীরে ধীরে বড়ো হয়ে উঠছিলেন। তাঁর একজন ভালো গুরুর প্রয়োজন ছিল। তাই পিতার আদেশে ভৃগুর মানসভ্রাতা, ঋষি অঙ্গিরার আশ্রমে শুক্রাচার্য বিদ্যালাভের জন্য গমন করলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে শুক্রাচার্য বুঝলেন ঋষি অঙ্গিরা তাঁর পুত্র বৃহস্পতির প্রতি বেশি স্নেহময় ও তৎপর। ব্রহ্মচর্যের এই প্রথম দিনগুলিতেই শুক্রাচার্য নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তিনি নিজে কখনও নিজের শিষ্যদের মধ্যে বিভেদ করবেন না। কিছুদিনের মধ্যেই ভগ্নমনা শুক্রাচার্য পিতার কাছে ফিরে আসেন। পিতা ভৃগু তাঁকে যথা সম্ভব বিদ্যা দান করেন এবং পরামর্শ দেন মহাদেবের আরাধনা করতে। তিনিই এই বিশ্বের পরম গুরু। জীবনের জটিল মুহূর্তেও শুক্রাচার্য সেই পরমগুরু শিবের কখনও অপমান করেননি।

দেব-দানবের চলতে থাকা যুদ্ধের কারণে পৃথিবী কোনোভাবেই জীবনের জন্য সুরক্ষিত করা যাচ্ছিল না। তাই ত্রিদেব অনেক আলোচনা করে ঠিক করলেন দেবতাদের সঠিক পরামর্শের জন্য একজন গুরু ঠিক করা হবে। সর্ববিদ্যায় পারদর্শী এমন একজনের খোঁজ শুরু হল। যথা সময়ে এই পদের জন্য বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্যের মধ্যে নির্বাচন শুরু হল। শিবের গভীর অনুগত শিষ্য শুক্রাচার্য কখনও দানব ও দেবতাদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেননি। দেবরাজ ইন্দ্রের তাই শুক্রাচার্যকে পছন্দ ছিল না। তিনি চাইছিলেন এমন এক গুরু যিনি তাঁর কূটনীতির পক্ষ নিয়ে ত্রিদেবের কাছে সওয়াল করবেন। তাই এবারও ছলের মাধ্যমে তিনি বৃহস্পতিই যে দেবতাদের গুরু হওয়ার উপযুক্ত তা প্রমাণ করলেন। গভীর অপমানবোধে শুক্রাচার্য আত্মাহূতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু শিব তাঁকে বরদান করেন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গুরুদের মধ্যে একদিন তাঁর স্থান হবে। অন্যদিকে দানবরা

বৃহস্পতির দেবগুরু পদে অভিষিক্ত হওয়ার খবর শুনে নিজেরাও এক গুরুর প্রয়োজন অনুভব করে। কিন্তু কোনো ব্রাহ্মণই তাদের গুরু হওয়ার প্রস্তাব স্বীকার করে না। অবশেষে তারা শিবের শরণাপন্ন হলে, তিনি শুক্রাচার্যকে দানবদের গুরু হওয়ার প্রস্তাব দেন। দানবরা শুক্রাচার্যের যোগ্যতা নিয়ে সন্দিগ্ধ ছিল না, কিন্তু তারা ভয় পেত শুক্রাচার্যের পক্ষপাতহীন মানসিকতাকে। অন্যদিকে শুক্রাচার্য এই প্রস্তাবে পুরোপুরি খুশি না হলেও, মহাগুরু শিবের আদেশ অমান্য করতে পারেন না। তাই তিনি রাক্ষসদের গুরু হওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

বৃহস্পতির সাহায্যে ইন্দ্র তাঁর কূটনীতি বজায় রাখেন এবং অসুরদের নির্বংশ করতে লেগে পড়েন। রাক্ষসরাজ বৃষপর্ব শুক্রাচার্যকে এ ব্যাপারে কিছু করার অনুরোধ করলে, তিনি শিবের আরাধনায় মগ্ন হন এবং মৃতসঞ্জীবনী লাভ করেন। দেবতারা ক্রমে কোণঠাসা হতে থাকেন। যত অসুরদের দেবতারা মারত, শুক্রাচার্য তাদের আবার জীবন ফিরিয়ে দিতেন। অন্যদিকে দেবতারা একের পর এক যুদ্ধে মারা পড়তে থাকলেন।

দেবরাজ ইন্দ্র পড়ে গেলেন চিন্তায়। ক্রমে দানবদের আধিপত্য বাড়তে থাকল। বৃহস্পতির সাথে অনেক পরামর্শ করে ইন্দ্র বৃহস্পতিপুত্র কচকে শুক্রাচার্যের আশ্রমে গুপ্তচর হিসেবে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। কচ খুশি মনে এই দায়িত্ব কাঁধে নেন।

যথা সময়ে কচ শুক্রাচার্যের আশ্রমে পৌঁছে নিজের পরিচয় দিয়ে বিদ্যার্জনের আগ্রহ প্রকাশ করেন। অন্যান্য রাক্ষস শিষ্যরা এর বিরোধিতা করে। শুক্রাচার্য কচের কাছে জানতে চান সে কেন তাঁর কাছে বিদ্যার্জন করতে চান? কচ জানান শিবের বরে শুক্রাচার্য মহাগুরুর সম্মান পেয়েছেন, তাই তিনি শুক্রাচার্যের কাছেই বিদ্যাচর্চা করতে চান। শুক্রাচার্য নিজের শৈশবের গুরুগৃহের পক্ষপাতিত্বের কথা স্মরণ করে কচকে বিদ্যাদান করতে রাজি হন। এবারও শুক্রাচার্য নিজের পক্ষপাত-হীনতার দৃষ্টান্ত বজায় রাখলেন। স্বভাবতই রাক্ষসরা গুরুর এই সিদ্ধান্তে খুশি ছিল না। তাই শুক্রাচার্য কচকে আশ্রমের বাইরে যেতে নিষেধ করে জানিয়ে দিলেন, কচ যতক্ষণ আশ্রমের মধ্যে আছে ততক্ষণ তার কোনো ক্ষতি হবে না। নিজের লক্ষ্যে অবিচল কচ খেয়াল করলেন না যে, গুরুকন্যা দেবযানী তার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন।

# নেতাজির নীল নকশা

১৯২২ সালে যখন পুরো দেশ গান্ধির বিপ্লবী অসহযোগ আন্দোলনে উত্তাল, তখন ভারতের প্রতিবেশী দেশ বার্মার পরিস্থিতি ছিল একেবারেই ভিন্ন। বার্মার রেঙ্গুন শহরকে তৎকালীন সময়ে 'লন্ডন অফ ইস্ট' বলা হত— ব্যাবসা, জনবসতি, চাকরি সব দিক থেকেই রেঙ্গুন ছিল বেশ স্থিতিশীল। যেসব ভারতীয়রা ব্যাবসা করতে চাইত তারা রেঙ্গুনকে তাদের উপযুক্ত মনে করত। এই সময়ই তামিলনাড়ুর একটি ছোটো পরিবার রেঙ্গুনে পাড়ি জমায়। সেই পরিবারে ১৯২৮ সালে জন্ম নেয় রাজমণি(বা রাজামণি)। রাজমণি ছিল পিতার খুব আদুরি কন্যা। সময়ের সাথে সাথে তাঁর পিতা এক সোনার খনির মালিক এবং রেঙ্গুনের সবচেয়ে ধনী ভারতীয়দের মধ্যে একজন হয়ে ওঠেন। তিনি ছিলেন গান্ধির মতের অনুগামী। সবসময় মাতৃভূমির প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা তিনি তাঁর মেয়ের মধ্যেও বিকশিত করতে চাইতেন। রেঙ্গুনের উচ্চবিত্ত হয়েও নিয়মিত দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম তহবিলে মুক্ত হস্তে দান করতেন।

১৯৩১ সালের এক দুর্ভাগ্যজনক সন্ধ্যায় রেডিয়োতে ভগৎ সিংয়ের মৃত্যুদণ্ডের সংবাদ প্রচারিত হয়। রেঙ্গুনেও সেই খবর আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ে। রাজমণির পরিবার সেই সময় আত্মীয়-পরিবারের সঙ্গে এক সান্ধ্য ভোজনে ব্যস্ত ছিল। কিন্তু এই খবর আসামাত্র উপস্থিত সবার মন এক শূন্য হাহাকারে ডুবে গেল। রাজমণি খুব ছোটো ছিলেন বলে তিনি ঠিকঠাক পরিস্থিতি বুঝে উঠতে পারছিলেন না। কিন্তু পরের দিন সকালের কাগজে, ভগৎ সিং-এর সাহস এবং আত্মাহুতি সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন। এই মহান বিপ্লবীর আত্মত্যাগ রাজমণির মন ছুঁয়ে যায় এবং তিনি বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে শুধুমাত্র সশস্ত্র বিপ্লবই ভারতে স্বাধীনতা আনতে পারে। সেই সময়ে ভারতীয় নেতাদের মধ্যে একমাত্র সুভাষ চন্দ্র বসু শহিদ ভগৎ সিং-এর পক্ষ নিয়ে রাস্তায় নেমে সশস্ত্র বিপ্লবের ডাক দেন। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাবে উল্লেখ করেন যে 'অহিংসা' কোনোদিনই ভারতীয়দের স্বাধীনতা এনে দিতে পারবে না। নেতাজির এই ডাক কলকাতার রাজপথ থেকে রেঙ্গুন পৌঁছাতে বেশি সময় নেয়নি। রেঙ্গুনে বসে ছোটো রাজমণি তাঁর জ্বলন্ত হৃদয়ে তুলে নিলেন বন্দুক আর তার লক্ষ্য হল ইংরেজ।

গান্ধিজি রাজমণির বাবার সাথে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের তহবিলের ব্যাপারে আলোচনা করতে তাঁদের বাড়িতে একবার গিয়েছিলেন। রাজমণির পরিবারের প্রত্যেক সদস্যই গান্ধিজির সফরের ব্যাপারে উত্তেজিত ও খুশি ছিলেন। কিন্তু রাজমণি বন্দুক ছোড়ার অনুশীলনে তাদের বাড়ির পিছনের উঠোনে ব্যস্ত ছিলেন। গান্ধিজি যখন জানতে পারলেন তখন তিনি রাজমণিকে

হিংস্রতার পথ থেকে দূরে সরে আসার পরামর্শ দিয়েছিলেন, হিংসা কেবল ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। তিনি কোনো উত্তর দেননি, কিন্তু তাঁর মনে একটি জ্বলন্ত প্রশ্ন উঠেছিল— ব্রিটিশদের কি সহিংসতার জন্য শাস্তি হওয়া উচিত নয়? কেন অহিংসা শুধু ভারতীয়দের জন্য! গান্ধির বিশ্বে লক্ষ লক্ষ অনুগামী থাকতে পারে, কিন্তু তিনি রেঙ্গুনের এই ছোটো মেয়েটির মন জিততে ব্যর্থ হন!

নেতাজি ইতিমধ্যেই ৪০ হাজারেরও বেশি সেনা নিয়ে তাঁর সেনাবাহিনী গঠন করেন— আজাদ হিন্দ ফৌজ। এদের বেশির ভাগই জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে পরাজিত হওয়া ব্রিটিশ-ইন্ডিয়ান আর্মির ভারতীয় বন্দি

সেনা। নেতাজি তাদের বিশ্বাস অর্জন করেন এবং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে নিজের মাতৃভূমির পক্ষে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ করেন। জাপানের জেনারেল তোজোর নেতৃত্বে আশি হাজার জাপানি সৈন্যবাহিনী আজাদ হিন্দ বাহিনীতে যোগ দেয়। নেতাজি বুঝতে পেরেছিলেন যে যুদ্ধ কেবল যুদ্ধক্ষেত্রেই জেতা যায় না। যুদ্ধের আগেই যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি নির্ধারিত হয়ে যায়! তাই তিনি সারা দেশে গুপ্তচর, বন্ধু এবং সঙ্গীদের ছড়িয়ে দেন এবং তারা গোপনে সিঙ্গাপুর, জাপান, রাশিয়া এবং বার্মাতেও আত্মগোপন করে নেতাজির পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষা করতে থাকে।

সুভাষ চন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য তহবিল সংগ্রহের জন্য রেঙ্গুনে আসেন। তিনি প্রত্যেককে অনুরোধ করেছিলেন যেন সামর্থ্য অনুযায়ী সবাই আজাদ হিন্দ তহবিলে দান করেন। রাজমণি তাঁর সোনার ও হীরার গহনা দান করেন আজাদ হিন্দ তহবিলে। অনুদান সংগ্রহকারী সেনাটি একটি ছোটো মেয়ের এহেন ব্যবহারে বেশ অবাক হয়ে রাজমণির নাম ও ঠিকানা লিখে রেখে দেন।

এর পর একদিন সকালে নেতাজি রাজমণির বাড়িতে উপস্থিত হন। নেতাজির এই হঠাৎ আগমনে রাজমণি আনন্দিত ও উত্তেজিত হয়ে পড়েন। নেতাজি একটি নাবালিকা মেয়ের ভুল ভেবে সমস্ত দান করা গহনা রাজমণির বাবাকে ফেরত দিতে চান। কিন্তু রাজমণি তাঁর নেতাকে নির্ভীক কণ্ঠে জানান, দান করা প্রতিটি গহনায় তাঁর পূর্ণ অধিকার আছে; তাই সেসব ফেরত নেওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না। একমাত্র যদি নেতাজি তাঁকে আজাদ হিন্দ বাহিনীতে যোগ দেওয়ার অনুমতি দেন, তাহলেই গহনাগুলি

ফেরত নিতে পারেন। মাত্র ১৫ বছর বয়সে, একটি সুস্থ বিলাস-বহুল জীবনের নিরাপত্তাকে হেলায় হারিয়ে রাজমণি যোগ দেন আজাদ হিন্দ বাহিনীতে। নেতাজি তাঁকে নার্সিং স্টাফ হিসেবে সেনা ক্যাম্পে যোগ দিতে অনুমতি দেন। নেতাজি এই যুবতির সাহস, আবেগ এবং বুদ্ধিমত্তায় প্রভাবিত ছিলেন। নেতাজি বললেন, দেবী লক্ষ্মী কোনো স্থানে স্থায়ী নন, কিন্তু একবার দেবী সরস্বতী যে স্থানে প্রবেশ করেন তিনি চিরতরে সেখানেই থাকেন। তাই তিনি রাজমণির নতুন নাম দিলেন সরস্বতী রাজমণি।

একদিন সরস্বতী হাসপাতালে দেখেন, একজন আইএনএ-এর সৈনিক টাকার বিনিময়ে এক ব্রিটিশ পুলিশকে কিছু গুপ্ততথ্য প্রদান করছে। তিনি সাত মাইল অতিক্রম করে INA সৈনিক প্রশিক্ষণের ক্যাম্পে পৌঁছে এ-সম্পর্কে নেতাজিকে অবহিত করেন। খুব শীঘ্রই নেতাজি বুঝতে পেরেছিলেন, এই অল্পবয়স্ক মেয়েটির মধ্যে এক বড়ো সম্ভাবনা লুকিয়ে রয়েছে।

সরস্বতী INA সৈনিক ট্রেনিং ক্যাম্পে অংশ গ্রহণে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। নেতাজি রাজমণির দেশের প্রতি ভালোবাসায় মুগ্ধ হয়ে ক্যাম্পের বাকি মেয়েদের সঙ্গে প্রশিক্ষণের অনুমতি দেন। প্রশিক্ষণ শেষে যুদ্ধক্ষেত্রে মেয়েদের মেয়েদের পাঠাতে নেতাজি রাজি ছিলেন না। কিন্তু অবিচল মেয়েরা রক্ত দিয়ে তাদের নেতাকে একটি চিঠি লিখল এবং মাতৃভূমির প্রতি তাদের ভালোবাসাকে পুনর্বিবেচনা করার অনুরোধ জানায়। নেতাজি এই চিঠিটি হাতে পেয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে যান এবং মেয়েদের একটি আলাদা আলাদা রেজিমেন্টের প্রতিষ্ঠা করার অনুমতি দেন। বেশির ভাগ মেয়েরাই রানি ঝাঁসি রেজিমেন্টে নিয়োগ পেল। নেতাজির আজাদ হিন্দ বাহিনী ছিল আধুনিক ইতিহাসে প্রথম রেকর্ডকৃত সেনাবাহিনী, যেখানে একটি সম্পূর্ণ কার্যকর মহিলা রেজিমেন্ট ছিল।

১৫ অক্টোবর ১৯১৭। সকাল চারটেতে দুজন মহিলা পাদ্রী নিয়ে কারাকক্ষে ঢুকে এল কিছু ফরাসি সেনা। কারাকক্ষে খুব নিশ্চিন্তে একজন মহিলা পরম নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছিলেন। তাকে ডেকে তোলা হল। তিনি সবাইকে দেখে একটু বিরক্ত হলেন। একটু বিরক্ত হয়েই প্রশ্ন করলেন, "এত সকালে কি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর না করলেই নয়? আমরা কি বিকালে তিনটের দিকে খেয়ে-দেয়ে তারপরে যেতে পারি না?" কারাকক্ষে দাঁড়ানো পাদ্রী ও সেনারা মাথা নেড়ে অসম্মতি জানায়। মহিলাটি নিজের জীবনের শেষ দুই ঘণ্টার জন্য তৈরি হতে শুরু করেন। কোথাও বের হওয়ার আগে প্রত্যেক বারের মতোই এবারও বেশ করে সাজলেন— দামি পোশাক, হিল তোলা জুতো, গায়ে শাল, মাথায় সুদৃশ্য টুপি আর হাতে লম্বা গ্লাভস। কিন্তু পার্থক্য এবার তিনি নিজেও জানেন এটাই তাঁর শেষবার! তাই হয়তো একটু বেশিই সময় নিলেন সাজতে।

হলিউডের বেশ পুরোনো একজন দুর্ধর্ষ অভিনেত্রী ছিলেন— গ্রেটা গার্বো। নাম শুনেছেন কিনা জানি না। তবে না শুনে থাকলে একবার সিনেমা-প্রেমীদের অল-টাইম প্রিয় হলিউড নায়িকাদের লিস্ট ঘুরে আসলে হয়তো দেখবেন ইনি প্রথম দশে আছেন। তবে গ্রেটাকে অনেকেই অনেকগুলো অন্য কারণে মনে রাখেন। গ্রেটা চূড়ান্ত সাফল্যের সময়েও নিজের ব্যক্তিগত সময় বন্ধুদের সঙ্গে বা পারিবারিক অনুষ্ঠানে কাটাতে ভালোবাসতেন। এমনকি যে বছর অস্কার নমিনেশন পেয়েছিলেন, সে-বছরও অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসেননি। এও বলা হয়, নিজের ব্যক্তিগত কাগজপত্র ছাড়া কোনো দিন কোনো ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে একটা অটোগ্রাফ পর্যন্ত দেননি। সেই গ্রেট গ্রেটার ১৯৩১ সালে একটি সিনেমা বেরিয়েছিল 'মাতাহারি', গ্রেটার সব থেকে বেশি আয় করা সিনেমাগুলোর একটি। এতটা গৌরচন্দ্রিকা করার কারণ হল, 'মাতাহারি' হলেন এমন এক মহিলা, যাঁকে গুপ্তচরবৃত্তির জগৎ সবথেকে গ্ল্যামারাস গুপ্তচর হিসেবে মনে রেখেছে। তাঁর জীবন ও চরিত্রের থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে বহু সিনেমা ও স্পাই থ্রিলার রচিত হয়েছে। কিন্তু সিনেমায় তো চিত্রনাট্যের কারণে অনেক কিছুই বদলে ফেলা হয় আর গ্রেটার সিনেমাও ব্যতিক্রম নয়। আজ বরং তাঁর গল্প করা থাক। সময় পেলে সিনেমাটা দেখলে হয়তো বুঝতেই পারবেন কী কী আলাদা সিনেমায় ছিল। যাই হোক, মূল গল্পে ফিরি।

৭ আগস্ট ১৮৭৬ সালে এক অভিজাত ডাচ টুপি ব্যবসায়ী বাবা আর জাভানিজ মায়ের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন মার্গারিটা জেলা (Margaretha Zelle)। ১৪ বছর বয়সেই মাকে হারান আর তারপরেই তাঁকে কনভেন্ট

স্কুলে পড়তে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এর পর মাত্র ১৯ বছর বয়সে ডাচ আর্মি অফিসার রুডলফ ম্যাকলেওডের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়ে যায়। সেই সময়ে ইন্দোনেশিয়া ছিল একটি ডাচ উপনিবেশ। সেখানেই রুডলফ পরিবার নিয়ে চলে যায়। রুডলফ ছিলেন মদ্যপ, রগচটা ও লম্পট। বেশিরভাগ সময় নিজে বিবাহিত হয়েও অন্য মহিলাসঙ্গ উপভোগ করতেন। তার উপরে মাঝে মাঝেই বুঝে শুনেই নিজের সহকর্মীদের মার্গারিটার সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপের ব্যবস্থা করতেন। পরে তাদেরই সুযোগ বুঝে ব্ল্যাকমেল করতেন। ১৮৯৬ সালে মার্গারিটার একটি ছেলে ও পরে একটি মেয়ে হয়। মদ্যপ ম্যাকলেওডের অন্যায়ের ফল ভোগ করতে হয় মার্গারিটার পুত্রসন্তানকে। ম্যাকলেওডেরই এক চাকর তাদের পুত্রসন্তানটিকে বিষ দিয়ে হত্যা করে। এর কিছু দিন পরেই মার্গারিটা বিবাহবিচ্ছেদ করে হল্যান্ড ফিরে আসেন ১৯০২ সালে।

হল্যান্ডে কদর্পকশূন্য অবস্থায় একা অসহায় মার্গারিটা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকেন। ক্রমে তাঁর বয়স ত্রিশের দিকে এগিয়ে চলেছে আর এদিকে হাতে কোনো কাজ নেই। তবে জাভায় থাকতে সেখানের আঞ্চলিক একটি নৃত্যদলে যোগ দিয়ে কিছু দিন নাচ করেছিলেন। তাঁর স্টেজনেম ছিল 'মাতাহারি'। মালয় ভাষায় যার অর্থ হল 'ভোরের চোখ'। তিনি অনেক ভেবে দেখলেন এই একটি কাজ করে দেখা যেতে পারে। সেই অনুযায়ী মেয়েকে এক আত্মীয়ের কাছে রেখে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করতে একটি দলের সঙ্গে প্যারিস যাত্রা করেন। খুব দ্রুত মাতাহারিতে প্যারিস মেতে উঠল। উচ্চবিত্ত নাইট ক্লাব ডেকে নিল তাঁকে। এর পর? এর পর সারা ইউরোপ মাতাহারির বিভঙ্গে উত্তাল ও উন্মাদ হয়ে উঠল। আর তাঁর সেই উন্মাদ প্রেমিকের দলে কোনো ছোটোখাটো লোকজন ছিল না। বিভিন্ন দেশের বড়ো বড়ো রাষ্ট্রদূত, সেনা অফিসার, কেউ বাদ পড়ল না। এমনকি এই লিস্টে জার্মান কাইজার উইলহেম দ্বিতীয়ের ছেলে যুবরাজ উইলহেমও ছিল। ক্রমে টিভি শো থেকে খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন সব কিছুর মাধ্যমে

লাস্যময়ী: মার্গারিটা জেলা ওরফে মাতাহারি

ইউরোপের বিনোদন জগতে ছড়িয়ে পড়েছিলেন মাতাহারি।

টানা নয় বছর ইউরোপকে নিজের শরীরী বিভঙ্গে পাগল করেছেন। কিন্তু বাধ সাধল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ১৯১৪ সালে সারা বিশ্বময় যুদ্ধের দামামা বেজে উঠতেই, তিনি বাধ্য হয়ে হল্যান্ড ফিরে আসেন। যুদ্ধের সময়ে কর্মহীনা মাতাহারি দুই বছর হল্যান্ডেই কাটিয়েছেন। হাতে কোনো কাজ নেই, আগের মতো অঢেল পয়সা বা বিনোদন কোনোটাই নেই। একটা সময় পর মাতাহারি নিজেই নিজের উরুত্তাপ জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হতে শুরু করেন। সেই সময়ই ১৯১৬ সালের মে মাসের এক সন্ধ্যায় জীবন তাঁকে অন্য রকম এক সুযোগ দেয়। হল্যান্ডের জার্মান দূতবাস থেকে জার্মান রাষ্ট্রদূত কার্ল ক্রামার গোপনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। কার্ল ঘরে ঢুকে বেশ অনেকটা সময় ধরেই একথা সেকথার মাঝে বুঝে নেন যে বাড়িতে আর কেউ আছে কিনা। বেশ কিছুক্ষণ পর তিনি নিশ্চিত হয়ে যান বাড়িতে সে সময়ে মাতাহারি ছাড়া আর কেউ নেই। ঠিক সেই সময়ই তাঁর আসল প্রস্তাবটি মাতাহারির সামনে রাখেন, "গত কয়েক বছরে ইউরোপের বিভিন্ন শহরে ঘুরে ইউরোপের সব বড়ো বড়ো সেনানায়ক থেকে রাষ্ট্রদূতেদের সঙ্গে আপনার ব্যক্তিগত জানাশোনা হয়েছে। প্যারিসের মতো একটা পূর্ণযৌবনা শহর ছেড়ে হল্যান্ডে আপনার থাকতে ভালো লাগে? আর একবার প্যারিসে ফিরে কি আপনার পুরোনো ভক্তদের সান্নিধ্য পেতে মন চায় না? আর এসবের ফাঁকেই অস্বাভাবিক কিছু শুনলে আমাকে জানাতেই পারেন।" মাতাহারি কিছুক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে বসে থাকেন। ক্রামার আবার শুরু করেন, "এর জন্য অবশ্যই আপনি ভালো দাম পাবেন। ২৪০০০ ফ্রাঁকস।" মাতাহারি শুধু উত্তর দেন, "হ্যাঁ, ২৪০০০ ফ্রাঁকস মোটামুটি ঠিকঠাক।" যদিও মনে মনে তিনি বেশ খুশিই হন। হাতে একদিকে কোনো কাজ নেই, অন্যদিকে সারাদিন বাড়িতে বসে একরকম বন্দিজীবন কাটাচ্ছেন। আর গুপ্তচরবৃত্তির থেকে থ্রিলিং আর কিছু হয় নাকি! আসলে মাতাহারি ব্যাপারটিকে একটি টাকা উপার্জনের মাধ্যম হিসেবেই দেখছিলেন, তাঁর বেশি কিছু নয়। যুদ্ধের